Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 285–292
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

সাহিত্যে স্বেচ্ছামৃত্যু যেন এক বিকল্প আরাম : জীবনানন্দ ও রবিশংকর

সুদেষ্ণা মৈত্র
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল : sudeshna.nil@gmail.com

Keyword
স্বেচ্ছামৃত্যু, অর্থহীন জীবন, শৈল্পিক হতাশা, অস্তিত্ব সংকট, ইলিউশন, নাগরিক শূন্যতা, রিপুক্লান্তি, অভিশপ্ত সন্তান, স্মৃতির যক্ষ, জরায়ুর অন্ধকার।

Abstract
বর্তমান বিশ্বে ইউথেনেশিয়া বা স্বেচ্ছামৃত্যুর প্রতি স্পৃহাবোধ মানুষের ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়েছে। বেঁচে থাকার বাঁধনগুলি প্রতিদিন হয়ে উঠছে নরম। এই অর্থহীন জীবনের ক্ষেত্রে বাস্তবের ভূমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ব্যর্থতাকে দায়ী করে জীবন্মৃত শরীরকেই মৃত্যুকামী হিসেবে ঘোষণা করছে। কিন্তু এই আত্মহত্যার অধিকারের দাবি শুধু শরীরের ইন্দ্রানুভূতিময় যন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য নয়। এই মৃত্যুইচ্ছা আসছে অনর্থক দিশাহীন আশাহীন আত্মগ্লানি দিয়ে নির্মিত মন থেকেও। এই মন যোগ ঘটাচ্ছে বোধ ও বোধির। এই যোগসূত্র সবচেয়ে বেশি স্থাপিত হয় নিবিড় শিল্পীসত্তায়। সেই ঘোর থেকে মৃত্যুকাঙ্ক্ষা জন্ম দেওয়ার শৈল্পিক কৌশল বহুভাবে করে গেছেন দুই কবি ও লেখকমন। কবি জীবনানন্দ দাশ এবং সাহিত্যিক রবিশংকর বল- যেন একই মুদ্রার দুটি অংশ। দুজনের বোধ ও মননের সংঘাতে বারবার ঘুরেফিরে এসেছে এই মৃত্যুনেশা। সেই নেশার বিশ্লেষণ বুদ্ধি দিয়ে করা সম্ভব নয়। অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করলেই বোঝা যায় মনের মৃত্যুই যেন শিল্পীর রচনায় প্রকৃত মৃত্যুর কান্না বা স্তব্ধতা। কবিতা ও গল্পের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্থবিরতা, জরায়ুমুখী প্রত্যাবর্তন-প্রবণতা কিম্বা হাওয়ায় মিশে যাওয়ার প্রবলতর হারিয়ে যাওয়ার কামনা, এই সবকিছুই মৃত্যুর প্রতি কবি ও লেখকের একান্ত আকর্ষণকেই প্রধান করে তোলে। জীবনানন্দের মৃত্যুর আটবছর পর জন্ম নেওয়া রবিশংকর তাঁর লিখনবিশ্বে যে মৃত্যুর আবহ রচনা করেন, সেই বিশ্বের সাথে মিল থাকে না জীবনানন্দের পূর্ববর্তী কোনো লেখকের মৃত্যুচেতনার। কবি যে ঘোরের পাঠশালা রেখে গেছিলেন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে,সেই পাঠশালার সবচেয়ে যোগ্যতম ছাত্র হয়ে উঠতে পেরেছিলেন লেখক রবিশংকর বল। জীবনানন্দের কাছে মৃত্যুর স্বাদ থেকে ফিরে আসার তাড়নায় বারবার ডাক পড়ে প্রকৃতির নিবিড় কোলের। কবি শান্তি পায় না কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া কোনোকিছুই পারবে না অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুনেশা থেকে কবি'কে থামিয়ে রাখতে। কিন্তু লেখক রবিশংকর বল যেন জীবনানন্দের থেমে থাকাগুলিকেই পরিণতি দিতে বন্ধ করে দেয় ঘরে ফেরার দরজা। ভেঙে দেয় স্মৃতি আর স্মরণের সাঁকো। মুছে দিতে চায় যেকোনো ভাবমূর্তির প্রতিষ্ঠান। অস্তিত্বকে বিলীন করে

দেওয়ার এই শৈল্পিক খেলায় লেখক দগ্ধ হতে হতে কোথাও যেন কবি'কে মুক্তি দেওয়ার পদ্ধতি খুঁজে চলেন।অনেকটা গয়ায় পিণ্ড দানের মতোই। এই পিণ্ডদানের ভার লেখককে কেউ দেয়নি। অভিশপ্ত পৃথিবীর অনিবার্য ভার বয়ে নিয়ে যেতে যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তানেরা হয়তো এভাবেই জন্ম নেয়- মৃত্যুপথকে চিনিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে।

Discussion

> "The possibility of killing one's self is a safety valve. Having it, man has no right to say that life is unbearable."[১]

এক আশ্চর্য জটিলতর মানসিক আকাঙ্ক্ষার নাম আত্মহত্যা। যে শব্দ উচ্চারণের মুহূর্তেই সিংহাসন ছেড়ে রাজা যেন ছাই আর মাটি। এক অনিবার্য রহস্যের প্রতি জন্ম হওয়ার পর থেকেই যেন দূরযান ডেকে চলে অবশ্যম্ভাবী পথের দিকে। পার্থিবতায় আকৃষ্ট ফড়িঙয়ের এর জীবন তার ক্ষুদ্র প্রাণশক্তির সবটুকু নিয়ে লড়ে যেতে চায় সেই শেষ রাত্রির অবধারিত গ্রাসের সঙ্গে থেকে নিজেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে। এই বেঁচে থাকার নেশায় কবে যেন মিথ্যে যাপনের তাপে ও মোহে মানুষ বিলিয়ে দেয় নিজেকে, শুধু খুঁজে পেতে নিতে অস্তিত্ব রয়েছে এমন কোন গ্যারান্টি কার্ড। কিন্তু শিল্পী হৃদয় প্রতিমুহূর্তে জীবনযাপনের মিথ্যে মেধা উপলব্ধি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং আক্রান্ত অনুভূতির সান্ত্বনায় একগাছা দড়ি হাতে দাঁড়িয়ে পড়ে অসত্য গাছের ডালের কাছাকাছি। যেন কোনো নক্ষত্র বহু বছর আগে মারা গেছে কিন্তু তার আলো পৌঁছে চলেছে এখনো এই বাস্তবের পৃথিবীতে বাধ্যতার বশে। ঠিক এভাবেই কোনো কোনো শিল্পী ঘরে বসে থেকে বাস্তব পৃথিবীর বুকে লিখে চলে তার নিজের হাতে গড়ে তোলা কবর বৃত্তান্ত। এমনই দুই কারুবাসকের নাম জীবনানন্দ দাশ এবং রবিশংকর বল। প্রথমজনের মৃত্যুর আট বছর পর জন্ম নেওয়া দ্বিতীয়জন বিগত জীবনানন্দ দাশের উত্তরসূরী হিসেবে নিজের গহনে সৃষ্ট হত্যার গল্প শোনায় পাঠকের কাছে। একজন কবি হিসেবে বারবার ফুটিয়ে তোলে জীবনের চরম সৌভাগ্যের চেতনায় মৃত্যুকামনাকে অপরজন পার্থিব রক্তমাংসের জড়িয়ে ধরা একঘেয়েমি, মেকি সভ্যতা থেকে সরে আসার জন্য বারবার নিজের প্রতিদিনের চলাফেরায় জন্ম দিয়ে চলে হত্যা বাসনার প্লট। এই ধরনের মৃত্যুচেতনা আত্মহত্যার সফলতা অপেক্ষা আত্মহত্যার প্রবণতাকে বেশি প্রাধান্য দেয় বলা চলে। এই প্রবণতা শারীরিক নাকি মানসিক নাকি শরীর ও মন জুড়ে রক্তের ভিতরে খেলা করে যাওয়া বিপন্ন এক স্রষ্টার?

আত্মহত্যা যখন সাহিত্যে উঠে আসে তখন তার অবস্থান যতোটা না শারীরিক, তার অধিক মানসিক। বিপন্ন বিস্ময়ের দুই পথিক যেন একেঅপরের পিতা-পুত্র সম্পর্ক বহন করতে করতে কখন যেন যক্ষ সেজে ওঠে। জমিয়ে রাখতে শুরু করে মৃত নদীর জল, মৃত গাছের পাতা, মৃত পাখির ডানা। একজন কবি, অপরজন গল্পকার। অথচ কখনো মনে হয় না দুজনের 'জঁনরা' আলাদা। এ যেন এক রূপান্তর প্রক্রিয়া। যন্ত্রণার বর্ধিত আধার। সেই আধারের স্রষ্টার চোখে ঘুরে বেড়ায় একইভাবে লাশকাটা ঘর আর আলো-ছায়ার অন্ধকারে ছুটে ছুটে ক্লান্ত বোধিকান্না। এই মৃত্যুচেতনা যা আত্মহত্যার উপকরণ সাজানো এক দীর্ঘ প্রতিক্ষারূপী বিষাদচর্চা সেই ক্ষেত্রেকে পরিস্ফুট করতে প্রথমেই চোখ ফেলা যাক কবি জীবনানন্দ দাশের পরিবেশিত একটি কবিতার দিকে। কবিতায় যে প্রকৃতিছায়ায় বেড়ে ওঠা বনহংস ও বনহংসীর জীবনকে আঁকতে সচেতন কবি, সেই ক্যানভাসে কবি প্রেম, উড়ান, চাঁদের আরাম এসকলের কথা বলতে বলতেই ঠিক পৌঁছে যাচ্ছেন গুলির শব্দের কাছে। এই পৌঁছে যাওয়াকে কবি ভয়ার্ত নয় বরং আশীর্বাদের চোখে দেখাতে চেয়েছেন, কারণ বাস্তবের পৃথিবীর বুকে জেগে থাকার যাপনক্লান্তি, ঘৃণার সারমেয়-অবস্থান কবি দেখে ফেলেছেন, বুঝে ফেলেছেন প্রতিদিনের ছলনা আর প্রেমের অভিনয়কলার সারসংক্ষেপ। এই টুকরো টুকরো নিত্যআয়োজিত সাধের অন্ধকার আর ব্যর্থতার শ্বাসকষ্ট যে মৃত্যুআবহ রচনা করে চলেছে নিয়মিত-সে অপেক্ষা ঢের ভালো একটিমাত্র গুলির আঘাতে শারীরিক চলাফেরার গতিস্তব্ধ মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া—

> "হয়তো গুলির শব্দ আবার,
> আমাদের স্তব্ধতা,
> আমাদের শান্তি।

আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না,
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;”[২]

রবিশংকর বল প্রথম বয়সে কবিতা লিখলেও পরবর্তীকালে গল্প ও উপন্যাসে নিজভূমি খুঁজে নিতে চেয়েছিলেন। তবে সেই ভূমির সাজে ছিলো না ফুলফুল জামার ছাপ বা প্রেমময় রোম্যান্টিক সন্ধ্যার কথা। লেখক যেন শুরু থেকেই একজন লিম্বোলেনে বসবাসকারী স্মৃতিদগ্ধ চরিত্র। তাঁর লেখা যেকোনো গল্পে টানা থাকে এক অদৃশ্য কাঁটাতারের বেড়া। যা টপকে আসার উপায়সন্ধানে অবিরত পরিশ্রম করে চলেছে সেই চরিত্র। আর টপকে না আসতে পারার ব্যর্থতা পুনর্জন্মের খোঁজে স্বীকৃতি দিচ্ছে বারবার সেই মৃত্যুকেই। লেখক যেন প্রতিটি আচরণের ভিতর দিয়ে কাতরচোখে দেখাতে আগ্রহী এই বস্তুতান্ত্রিক প্রযুক্তিপ্রিয় সভ্যতায় জীবন কতোটা অর্থহীন। একটা সামান্য ঝরা পালকও যদি আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা যেতো, লেখকের চরিত্রগুলি কি সে চেষ্টা করতো না? কিন্তু কই? মানুষের ষড়রিপু হয়ে দাঁড়ায় মানুষের বেঁচে থাকার পথের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। লেখক তাই মৃত্যুর সূত্রপাত ঘটালেন রিপুকেই হত্যা করে। কাম-ক্রোধ-বাসনাহীন এক নির্জীব জীবনে লেখক পৌঁছে দিতে চাইলেন তাঁর গড়ে তোলা চরিত্রকে। যে শুধু খুঁজে খুঁজে মরে কোনো তরুণীর সম্পূর্ণ উন্মুখ দুটি সুডৌল হাত। কেন? কারণ সেই চরিত্রের মধ্যে ওই অতটুকু কামই বেঁচে ছিলো তখনো অবধি। সেই স্পৃহারও মৃত্যু ঘটে যাওয়ার পর চরিত্রের ‘অবনী’ হয়ে উঠলো পুরোপুরি মুক্ত। শরীর থেকেও প্রবৃত্তির প্রতিটি স্তরের মৃত্যু তাকে সমান করে তুললো তার স্ত্রী লতা'র সাথে, যে লতা'র জরায়ু কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে বহু আগে। এ এক অদ্ভুত মৃতের কাহন। তারুণ্যের ঝকঝকে মোহময়তার প্রতীক দেবপ্রিয়ারা তাই এই নিস্পৃহতার বারান্দায় খণ্ড খণ্ড করে খুলে রেখে যায় স্তন যোনি হাত। চরিত্র বলে ওঠে—

> “আমার আর বীর্যপাত হয় না। আমি মৃত, দেবপ্রিয়া। আমার প্রধান শত্রু আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমি আর কার সঙ্গে লড়াই করে বাঁচব? বহুদূরে কোনো গির্জা থেকে যেন ভেসে আসে দেবপ্রিয়ার কণ্ঠ, ‘আমেন’।”[৩]

জীবনানন্দের কবিতায় বারবার এই নিস্পৃহতার জন্ম হয়েছে নানাভাবে। কখনো শিশু-নারী পাশে রেখে মৃত্যুকেই প্রয়োজনীয় বলে বেছে নিয়েছে কবিতা'র নায়ক, আবার কখনো কবিই কথক সেজে শুনিয়ে গেছে মেয়েমানুষের প্রতি ভালোবাসা-ঘৃণা ও অবহেলার আখ্যান। পিতলের প্রতিমা বা পার্থিব ক্ষুধার ঈশ্বরী রূপে নারীসম্পর্কিত এই কল্পনায় কবি'র ব্যর্থ প্রেমিকসত্তা দায়ী তবে এসব পেরিয়ে যে ঘোরের জন্ম হয় কবি'র হৃদয়ে তার ভিতরেও শোনা যায় সেই হত্যাপ্রবণ আকাঙ্ক্ষা বা মৃতরূপে নিজেকে চিনিয়ে দেওয়ার অগাধ কষ্টার্জিত সত্যের কথা। এই অনুভূতিহীন পৃথিবীর মাঝে প্রেম-স্নেহ-সহানুভূতির মতোই তিনিও যেন বেমানান। যান্ত্রিক কলকারখানার বৃত্তে চাকার পেষণে আবর্তিত কবিও কখন যেন নিজেই শিকারী সেজে শিকার হিসেবে তাক করছেন নিজের দিকেই বন্দুক। তুচ্ছ সহানুভূতি, সস্তা শোক, দুদণ্ডের হৃদয়ের মোচড়কে উপহাস করে কবি নিজেকে শুইয়ে দিচ্ছেন টানটান কোনো মৃতেরই পাশে—

> “মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি;
> বিয়োগের-বিয়োগের-মরণের মুখে এসে পড়ে সব
> ঐ মৃত মৃগদের মতো।
> প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা মৃত্যু পাই;
> পাই না কি?”[৪]

এই অনিমেষ দর্শন পাঠককে এনে দাঁড় করায় নিজের মুখোমুখি। এই মুখ, সকল দৃশ্যকে ছবি করে রেখেছে তার অভিব্যক্তির আশ্রমে। ব্যথা, ঘৃণা, প্রতারণা আর প্রত্যাখ্যান যেভাবে মানুষের ন্যূনতম আশাবোধকেও অবজ্ঞার সমতুল্য করে তুলেছে অভিজ্ঞতার আসনে, সেই আশাহীন-অনুভূতিহীন-প্রেমহীন-বিশ্বাসহীন এই যে বেঁচে থাকা এও তো এক মৃত্যু! নিজের মাংসটুকু আঁকড়ে শুধু আদমশুমারীর একটি কণা হয়ে থেকে যাওয়া মৃত্যু নয়?

রবিশংকর বলের লেখায় এই আশার মৃত্যু বড়ো বেশি বেজে ওঠে। আসলে সংবেদনশীল শিল্পীস্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য অচেনা মানুষের কষ্ট আর নিজের কষ্টের ঘনত্ব মিলিয়ে ফেলা। সেখানে যে সুরে নকশালিস্ট-সন্তান হারানো বৃদ্ধ

পিতার দরজা খুলে অপেক্ষমান চিত্র থেকে উঠে আসা কান্না বাজে, তেমনই সমান কারুণ্যে বেজে ওঠে কোনো এক অন্ধ বাবা'র লেখার কাগজ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার যন্ত্রণাও। আর এই প্রতিটি কান্না লেখকের চরিত্রগুলিকে অবধারিত ভঙ্গিতে নিয়ে যায় কবর খননের পথে। ছেড়ে আসা দেশ জড়িয়ে বিধ্বস্ত একজন ডিমেনশিয়ার রুগী মায়ের দাদা হয়ে উঠতে উঠতে ভুলে যায় নিজের পরিচয়। আর্কিটেক্ট হয়ে মিউজিয়াম বানানোর কাজে নিয়োজিত একজন দেখে ফেলে কী বিপুল পরিশ্রমে নিজেদের ক্ষত ও ক্ষতিকে ভুলে থাকার জন্য মানুষ মদ খাচ্ছে, যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হচ্ছে। অতৃপ্ত অপ্রেমে মাখা বারবার যৌনক্রিয়া আর চামড়ার প্রসাধনকলায় সকলে বারবার জানান দিতে মরিয়া তাদের বেঁচে থাকার কথা। আর এই মৃতের সংসারে সেই স্থাপত্যশিল্পী খুঁজে পাচ্ছে অসংখ্য মৃত প্রজাতির মাথার খুলি। যাদের স্তরে স্তরে সাজিয়ে এক প্রাণহীন মিউজিয়াম সাজিয়ে তোলাই দেশের সরকারের নেক্সট প্রোজেক্ট। মৃত্যুর ডাইমেনশন বহুভাবে পালটে দিলেও লেখক আসলে বলতে চাইছেন সেইসকল বিধ্বংসী সভ্যদের অরাজক লোভের কথা, যাদের আতঙ্কের দাগ লেগে থাকে এই প্রজন্মের গায়ে। বাথরুমে মলত্যাগ করতে বসে আঙুল দিয়ে টিপে মেরে চলা পিঁপড়েদের দিকে তাকাতেই মনে পড়ে যায় হিটলারের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের দৃশ্য। তাই রবিশংকর বলের চরিত্রেরা সৃষ্টি করে ইলিউশনের–-

> "আমাদের পৃথিবীর এক প্রয়োজনীয় ইলিউশন, এই আকাশ। আমাদের বাস্তবতা তো কয়েকটি বাড়ি, রাস্তা, যানবাহন, মিসাইল, অফিসের চেয়ার, কনডোম, লিফট- হাতে গোনা যায় এমন কয়েকটি জিনিস। আর সবই বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় ইলিউশন। কিন্তু কোন বাস্তবতার জন্য নীতিশ এই ইলিউশনকে হত্যা করতে চায় না, সে আসলে একটি বাসনার জন্ম দিতে চায়, যা হত্যালিপ্সা। জীবন-সম্পর্কিত যাবতীয় দর্শন এই বাসনাকে কখনও জন্ম দিতে চায়নি ।মানুষ হত্যা করেছে অন্ধভাবে, প্ররোচনায় বা কোনো আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। নীতিশ এই হত্যাবাসনার স্রষ্টা, যা অ্যাগনেসের নীলবিন্দুর মতো নির্মল আনন্দ দেবে শুধু।"[৫]

এই নির্মল আনন্দের খোঁজেই কি জীবনানন্দকেও বেছে নিতে হয় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগানোর পথ? মেধার ভিতর বেড়ে চলা প্রতিদিনের অভিশাপ আর বাস্তব পৃথিবীকে অনিবার্যতার কারণে ছুঁয়ে-ছেনে বুঝে নেওয়ার হাহাকার কবি'কে টেনে নিয়ে যায় এক ভাবমূর্তিহীনতার দিকে। সদ্যোজাত শিশুর মতো ধারণার বাইরে কবি'র বোধ ও যাপনের মিলিত আবহে গড়ে তোলা বৃত্ত। বুদ্ধদেব বসু তাঁকে চিহ্নিত করেন নির্জনতম কবি হিসেবে, আবার সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে বাণবিদ্ধ করেন আত্মধ্বংসী ক্লান্তিময় নেতিবাচক কবি রূপে। কিন্তু এর কোনোটাই জীবনানন্দকে চেনার প্রকৃত পরিসর নয়। একজন উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক যাঁর কাছে অতীতের স্মৃতি-দহন আর পাপের ইতিকথা বারবার যোগসূত্র তৈরি করতে চায় বর্তমানের কংক্রিটআবহে ঘেরা আত্মদংশনের সঙ্গে। একজন স্থির সমাধান না চাওয়া বেদনার সন্তান যে জানে ক্রমে পৃথিবীতে অলিখিত সময়ের রাত্রি ঘনাচ্ছে। আকাশের নীলিমা যাচ্ছে কমে। ফুলের গন্ধ আর আশ্চর্যের জন্ম দেয় না। আঘাতেও আর ভয় পায় না মানুষ, কারণ আঘাতে আঘাতে ক্রমে সব ব্যথাহীন হয়ে গেছে। জীবনানন্দ চোখের সামনে সভ্যতার মৃত্যু দেখতে পাচ্ছেন আর লোল নিগ্রের অভিজ্ঞ চোখে আদিম জন্তুর প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের সাথে মিল খুঁজে ফেলছেন মানুষের আচরণের। এই ব্যথা, মানবাত্মার নিরন্তর অবক্ষয় এও তো এক মৃত্যুরই আখ্যান! যেন তমসার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের আজ মর্মস্থলে অন্ধকার ভেসে উঠছে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শরীরে হাত বোলালে 'জীবন' কবিতাটিকে অসঙ্কোচে মৃত্যুর জয়গানময় এক কবিতা বলে মনে হয়। এই স্রোতে প্রেম ও মৃত্যুকে এক করে দেখেছেন কবি। যেন প্রেমের আবহের মতোই সমান মৃত্যুর টান-আচরণ। দুরন্ত আহত চিতার মতো দ্রুতবেগে তার যাতায়াত। সে আসে ফসলের কান্না হয়ে, যৌবনের জ্বর হয়ে, নক্ষত্রের ক্ষয় হয়ে তার আগমন। এই তুমুল শক্তির প্রতি কবি'র প্রবল আকর্ষণী বিবরণ বুঝিয়ে দিতে সক্ষম তাঁর মৃত্যুকাঙ্ক্ষাবোধ—

> "...নতুন জানিবে কিছু হয়তো বা ঘুমের চোখে সে!
> সব ভালোবাসা যার বোঝা হল-দেখুক সে মৃত্যু ভালোবেসে!"[৬]

জীবনানন্দ যে শুধু মৃত্যুর ব্যক্তিকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা করে গেছেন তাই নয়, 'মরণ রে তুহু মম শ্যাম সমান' এই বোধের দ্বারাই চালিত হয়েছেন কবি। কবি জীবনানন্দ যথার্থই প্রেমিককবি। এই প্রেম মৃত্যুকে ঘিরে প্রবলভাবে বিদ্যমান। এই রূপের পৃথিবী- ঘ্রাণের পৃথিবী- শ্রবণের পৃথিবীর প্রতি কবি'র আকর্ষণ তীব্রভাবে ফুটে ওঠে ঠিক তখনই, যখন শিওরে মৃত্যু এসে দাঁড়ায় তার অনতিক্রম্য অবস্থান নিয়ে। কবিও সেই মৃত্যুর চোখ দিয়েই মাটির পৃথিবীর নদী-আলো-কুয়াশা-মাঠ-

সুপক্ক যবের ঘ্রাণ নিতে থাকেন এমনভাবে যেন এই শেষ গ্রহণমুখর কাল। এই শেষ চেয়ে দেখা। হাতের স্পর্শের চাল ধোয়া গন্ধের স্বাদ এতটা নিবিড় হোক যেন কবি মৃত্যুকে পরম স্নেহে গ্রহণ করতে পারেন নিজের সবটুকু শরীর-মনের আদর দিয়েই।

সাধারণের এই মরপৃথিবীতে ফ্রিজ, টিভি, গাড়ি, বাড়ি, প্রেম, উষ্ণতা, বিলাস, বিজ্ঞাপন কামড়ে একজন সংবেদনশীল অনুভূতি-আক্রান্ত ব্যক্তি কতদিন শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারে? এই ব্যক্তিই তো হাতে কাস্তে তুলে মাঠে গেছিলো শান্তির মোহে। বালতি ভরতি জল হাতে সেই যে সংসার-সংসার খেলার বৃথা চেষ্টা? শরীরে জলে গন্ধ মেখে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তুমুল পরিশ্রম? তারপরেও কি সম্ভব? সম্ভব নয়। শুধু জীবনের উত্তেজনাকে ভালোবেসে, প্রাণস্রোতকে ভালোবেসে বেঁচে থাকতে হয় বলে বেঁচে থাকতে চায়নি আট বছর আগের একদিনের এক বোধিগ্রস্ত ভূতগ্রস্ত ব্যক্তি। এই দোয়েলের, ফড়িংয়ের তিরতির বেঁচে থাকার গাঢ় স্বাদ সে আর কোনোদিন উপভোগ করতে পারবে না বুঝেই চিৎ হয়ে চিরঘুমকেই বেছে নিলো সে। আর তারই যেন আট বছর পরে আশ্চর্যভাবে জন্মগ্রহণ করছেন রবিশংকর বল। এ কি মৃত্যুচেতনার সন্তানভার নাকি অবশিষ্ট আখ্যান? -

> "...চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
> একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা;
> যে জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের-মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা
> এই জেনে।"[৭]

রবিশংকর বল প্রবল ঘোরের চোখে পৃথিবীর মাঠ-ঘাট-পথে খুঁজে চলেছেন মৃত জীবনানন্দের অস্থি-অস্তিত্ব। নিজের অজান্তেই লেখকের গল্পে চরিত্রের আধারে বসে পড়ছেন জীবনানন্দ। যেন পূর্বের ক্ষতয় জমে থাকা রক্ত, মাংস, ক্লেদ থেকে ব্যথা সংগ্রহ করে তার নিরুত্তর অন্ধকারে কার্যকারণ বসাতে আগ্রহী লেখক নিজেকেই বানিয়ে ফেলছেন কবি'র উত্তরসূরী। 'ক্যাম্পে' নামক একটি গল্পে বাবা'র হাতে প্রতি মাঝরাতে অত্যাচারিত হচ্ছে ছোটো ছোটো দুই ছেলে-মেয়ে। পিতা'কে বারবার মায়ের ঘর থেকে বাসিমুখে ফিরতে দেখে তার সন্তান। মা তার সৌন্দর্যের আভায় উজ্জ্বল এক অসুখী আত্মা। দুই সন্তানকে দূরে সরিয়ে রাখে পিতৃমুখী ছাপ লক্ষ করে। স্ত্রী-প্রেম বর্জিত বাবা'র সন্তানকে অনিবার্যভাবে হয়ে উঠতে হয় মাতৃপ্রেমবর্জিত সন্তান। নারীপ্রেমহীন এই পূর্বলিখিত ভবিতব্যের হাত থেকে বাঁচতে বাবা ও ছেলে পরস্পরকে অভিযোগ করে চলে। বাবা বলে ওঠে—

> "না। আমরা দুজনেই রক্তাক্ত হতে চেয়েছিলাম শুভ। এমন এক জীবনে আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম যেখানে সবসময় বিপদের সম্ভাবনা আমাদের জাগিয়ে রাখে। নাহলে বেঁচে থেকে স্বাদ নেই।"[৮]

লেখক দেখাতে চাইছেন এই জেগে থাকাটুকুর মধ্যেই যতোটুকু যা বেঁচে থাকার সারমর্ম। নিজেকে জাগিয়ে রাখার প্রাবল্যে একটা খুন হোক, একটা ভূমিকম্প হোক, হোক কোনো বিপুল জলোচ্ছ্বাস। কিছু একটা হোক। নাহলে মৃত দুই চোখ পড়ে ফেলবে একে-অপরকে। বুঝে যাবে অসাড় দেহব্রহ্ম নিয়ে এই যে নিজের মাংস আঁকড়ে শুয়ে থাকা- এর নাম মৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুর রহস্য বরাবর এক অবগুণ্ঠিত সৌন্দর্যের মতোই রহস্যঘন ছিলো। রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছামৃত্যুকে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন সাংসারিক জটিলতা থেকে মুক্তির দুঃখিত পরিণামের মতোই। বঙ্কিমচন্দ্রও সমাজের ন্যায়নীতিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার স্বরূপকে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্বেচ্ছামৃত্যুর কোনো আভাস নেই। থাকতেও পারে না। কবি সেখানে শুভচেতনাবোধে উজ্জ্বল এক রবি। আত্মহত্যা সেখানে পাপের মতোই অস্পৃশ্য। মৃত্যুর অনিবার্যতার মধ্যে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা বহুভাবে ফুটে উঠলেও তার ভিতর পৃথিবীর প্রতি কোনো আক্রোশ বা বিষাদ নেই। শরৎচন্দ্র এবং তাঁর চোখ দিয়েই দেখতে অভ্যস্ত অসংখ্য সাধারণের সমাজ একমাত্র সেই মৃত্যুকেই আজও সহানুভূতির চোখে গ্রহণ করে যা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে গলায় ফাঁস কিম্বা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কষ্টে স্বেচ্ছামৃত্যু। খবরের কাগজও এই মৃত্যুগুলিকেই চিহ্নিত করতে পারে কার্যকারণের গতিবিধি মেনে। কিন্তু এই যে প্রতিদিনের মৃত্যু! প্রতিমুহূর্তে ছেড়ে আসা মাটির জন্য চিরন্তন উদবাস্তু মনের কান্না আর চিৎকার! মৃত্যু শব্দের শারীরিক প্রয়োজনকে

অস্বীকার করে বারবার হৃদয়ের কবরের জন্য খুঁড়ে চলা মাটির আয়োজন! নিজেকে হারিয়ে যাওয়া এক স্বেচ্ছানিরুদ্দিষ্ট মানুষ হিসেবে কল্পনা করে চলা! এইসব মৃত্যুর আঘ্রাণ ছাপতে পারে না খবরের কাগজ। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সিঁড়ি হতে চাওয়া চেতনার বিষাদ মেপে নেওয়ার ক্ষমতা নেই সাধারণ সমাজেরও। এক দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর অস্তিত্ববিষণ্ণ ক্ষোভ, যা অস্বীকারের জন্য পার্থিব কোনো সরঞ্জাম সাহায্য করতে পারবে না। এই মৃত্যুবোধ রবীন্দ্রনাথে মিলবে না। শরৎচন্দ্র দিতে অক্ষম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শশীকে টিলায় দাঁড় করিয়ে আশাহীনতার এক বিপন্নতাকে দেখাতে পারেন বটে কিন্তু দেশ-সমাজ-সমকাল জুড়ে ক্রমান্বয়ে ঘটে চলা যুদ্ধ, বিচ্ছেদ, রাজনীতির কার্ফিউ, পুনর্বাসননীতি, নির্বীজসমাধি কিম্বা নির্বিচার হত্যারব যেভাবে একজন অনুভূতিশীল সচেতন সংবেদনশীল মনকে বানিয়ে দেয় পৃথিবীর অভিশপ্ত সন্তান- সেই অভিশাপের দায়ভার পালন করে চলা হয়ে ওঠে অনিবার্য। হাসি-কান্না-আবেগ-যৌনতা সবটাই হয়ে ওঠে নিয়মমাফিক মেকী অভিব্যক্তির মতোই অভিনয়-উপভোগ্য আর সেই উপভোগ খুব দ্রুত হয়ে ওঠে ক্লান্তিকর। মাল্যবান ঘুরে চলে উৎপলার পিছু পিছু। প্রেম গেছে, অনুরাগ হারিয়েছে, আন্তরিকতা, সহানুভূতি সব গেছে সরে। তবু শরীরের খিদেটুকুর জন্য কুকুরের মতো বসে থাকে মাল্যবান উৎপলার ডাকের আশায়। উৎপলা সেখান থেকেও দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় মাল্যবানকে। জীবনানন্দের মাল্যবান, হেম, নিশীথেরা হৃদয়ে নিয়ে ঘোরে এক অদ্ভুত মৃত্যুর শান্তি আর স্থিরতা। চির অমলিন এক অন্ধকারবোধ। এই অন্ধকারের উৎপত্তি কখনোই শুধুমাত্র প্রেমের ব্যর্থতা বা চাকরি ক্ষেত্রে অসফলতা থেকে জেগে উঠতে পারে না। এই অমোঘ দুর্নিবার বেদনার ধন যেন কবি পুষে রাখে গভীরে। লালন করে সন্তানের স্বরে। তাই কবি'র কাছে কতোভাবে মিথ্যে হয়ে গেছে 'চমৎকার', 'উৎসব' শব্দগুলির মাহাত্ম্য। জরায়ুর কাছে ফিরে যেতে চায় কবি আরেকবার নতুনভাবে জন্ম নেওয়ার আশায়। শুধুমাত্র জন্ম নেওয়ার আনন্দে। ব্যস্। ওটুকুই। জন্মটুকুই শুধুমাত্র এখনো চেয়ে দেখার মতো নির্মল রয়েছে কবি'র গহনে। এরপরের কোনো বিস্তার ফিরে আসে না তার চাহিদাক্ষেত্রের সীমানায়। অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর মৃত্যুর সাথে সহবাসের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা কবি'কে বারবার টেনে নিয়ে গেছে কখনো মৃত নক্ষত্রের মতো জীবনের কাছে, কখনো বনহংসের মতো প্রকৃতির কোলে, কখনো ঘাসের মতো মাটির রসের অন্দরে। কিন্তু কখনোই আর মানুষ হতে চাইতে পারেননি কবি সেভাবে। শঙ্খচিল, শালিক, কাক, পেঁচা এদের জীবনে যে টুকরো টুকরো মৃত্যু থাকে না! এদের জীবনে যে অভিশপ্ত সন্তানের ভার নেই লেগে! শত শত শূকরের চিৎকার আর প্রসব-বেদনার আড়ম্বরের পৃথিবীতে কবি'র যেভাবে বেঁচে থাকার সাধ নেই আর মানুষ-জন্মের লোভে। যেন সেভাবেই ব্যবহৃত হতে হতে শূকরের মাংস হয়ে যাওয়া এই অন্তঃসারশূন্য সমাজে রবিশংকর বলের মতো লেখকেরা গল্পের ভিতর দিয়ে হারিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে চলে। চারশো বছরের পুরনো হ্যামলেটের 'To be' আর 'not to be' ঘিরে এখনো প্রশ্ন করে চলে। বাড়তে থাকতে সন্দেহ। জমতে থাকে নিরুত্তরের পাহাড়। ধীরে ধীরে প্রশ্নও যায় ফুরিয়ে। হ্যামলেটমেশিনের গড়নে নিজেকে বসিয়ে নেয় গল্পকথক। তার আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

হতাশা, অনাস্থা, একাকীত্ব উপড়ে ফেলে জীবন সম্পর্কে কোনো আগ্রহবোধকে। বিপ্লবের ফ্যান্টাসির মোহভঙ্গ হতেই রাশিয়ার বহু লেখক বেছে নিয়েছিলো আত্মহত্যাকেই জীবনের আরাম হিসেবে। সাধারণ ব্যাখ্যার আলেখ্যে ধরা পড়ে না এসকল মৃত্যুর হেতু। মানুষও তাই হাল ছেড়ে দেয়। ভাবে না। স্থানীয় সংবাদপত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না এই মৃত্যুর রহস্য। পাশে বসে 'অস্বাভাবিক' শব্দের পরিহাস। আমাদের মৌল বোধগুলিকে যেন এক হ্যাঁচকা টানে মুখ থুবড়ে ফেলে দেখিয়ে দেওয়া- বুদ্ধি দিয়ে সব কেন'র হদিশ মেলে না। এই মৃত্যুকাঙ্ক্ষা কোনো নারী বা পুরুষের প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার জন্য নয়। অর্থ কীর্তি স্বচ্ছলতা সব থাকে, সব থেকেও সিলভিয়া প্লাথ টুক করে জ্বালিয়ে দেয় গ্যাস বার্নার, আর কেমন ভুলে যায় নেভানোর কথা। ভার্জিনিইয়া ধীরে ধীরে এগিয়ে যায় জলের দিকে তাঁর সবথেকে প্রিয় শখকে আঁকড়ে নুড়িপাথর কুড়োতে কুড়োতে ডুবে যায় অতলে, সহজে, অনায়াসে দস্তয়ভস্কির 'কারামাজহব ভ্রাতৃগণ' উপন্যাসে সেই খুনী জারজপুত্রদের আত্মহত্যা প্রকারান্তরে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়া ছিলো। ছিল পাপ-পুণ্যের মাপকাঠি। কিন্তু জীবনানন্দের আকাশ ধরে এগিয়ে চলা দিগন্তরেখা বরাবর কোনো শিল্পীই তার ঈশ্বরকে জীবিত অবস্থায় পায়নি। চারপাশে যেন এক নাস্তির অন্ধকার। শিকড়হীনের ইতিহাস। এই যন্ত্রণার কোনো উপশম নেই। স্বপ্ন যেটুকু বেঁচেবর্তে আছে, তারাও এসে জানিয়ে যায়—

"স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায়ঃ স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো;

নিস্তব্ধ শীতের রাতে দীপ জ্বেলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে
স্থবিরের চোখে যেন জমে ওঠে কোন্ বিকেলের আলো।
... ...
স্থবিরতা, কবে তুমি আসিবে, বল তো।"[৯]

এই থেমে থাকার নামই মৃত্যু। ঘুম থেকে উঠেই চিরঘুমের বাসনা। সারাদিনের জহ্লাদময় আবরণের ধুলোবালি ঝেড়ে চুপচাপ কুয়াশার মতো হিমশীতল শুয়ে থাকার ইচ্ছের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লান্তিময় দুই চোখ। যার আর কিছু দেখা বাকি নেই। বাকি নেই আবার জেগে ওঠার পার্থিব আনন্দ। জন্ম জন্মান্তরের মৃত স্মৃতির পথ ধরে এগিয়ে চলা ঘোরাবিষ্ট বিষাদঘন মানুষের হৃদয়ে আর হদিশ পাওয়া যায় না কোনো স্পষ্ট আলোর। শুধু শরীরটুকু নিয়ে পড়ে থাকা এই অপেক্ষার চেয়ে মৃতের মহিমায় উদ্ভাসিত হওয়া যেন ঢের ভালো। বেঁচে ছিলো কবি, একদিন বেঁচেই ছিলো। জ্বালাতে চেয়েছিলো শুদ্ধ আলো কিন্তু ছিলো না প্রদীপের আধার। তাই কবি দিনের সিঁড়িপথকে অস্বীকার করে অন্তঃশূন্যে হিম হয়ে থেকে যেতে চান।

রবিশংকর দেখতে পায় সেই স্মৃতির মৃত সাঁকোকে। হাঁটতে থাকে সেই পথ ধরে। হাতে এসে যায় অনেকদিন আগে ফুরিয়ে যাওয়া বাবা'র আনন্দ জমিয়ে রাখা লালবাক্স। কিন্তু সেখানেও মৃত্যুর গন্ধ। জীবনানন্দের ট্রাঙ্কের মতোই। লেখক ছুটতে থাকে। একটা কিছু এমন থাকুক যাকে জড়িয়ে অন্তত নিঃশ্বাস ছাড়া যায়! নেই। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে মৃত সাম্রাজ্যের কণ্ঠস্বরে বাবা পাগলাগারদে চলে যায়। মা খুঁজে পেয়ে যায় অনিবার্য বিষবড়ি। ছেলে উলঙ্গ হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ায়। সৃষ্টির আদিকাণ্ডে পৌঁছানোর করুণ আর্তনাদ ঘুরে বেড়ায় গোটা বাড়িময়। দারিদ্রের ফুটপাথ দিয়ে কান্নাপ্রবল হৃদয় নিয়ে কোনো এক আত্মা এগিয়ে যাচ্ছে ঠেলাগাড়ি হাতে। ঠেলাগাড়িতে বসে রয়েছে বৃদ্ধ, শীর্ণ কুষ্ঠরোগী। অদূরে কাপড়ে মোড়া নারীদেহের ধর্ষিত লাশ। এরমধ্যে দিয়েই পৃথিবী স্থির হয়ে যায়। গল্পলেখক রবিশংকর দেখতে পান জীবনানন্দ এই স্থবিরতার ভিতর বেছে নিচ্ছেন সেই আত্মহত্যাকেই। না কোনো ফাঁসিদড়িতে ঝুলে কিম্বা অমোঘ ঘুমের ওষুধ খেয়ে নয়। পৃথিবীর বুকে আর ফিরতে না চাওয়ার বাসনায় নিছক অদৃশ্য হয়ে যেতে চাইছেন জীবনানন্দ। হারিয়ে যেতে চান পুরো অর্থেই। শুধুমাত্র অপর মানুষের চোখের সামনে থেকে নয়। নিজের ঘরে রচনা করে চলা আত্মবিদ্রোহী সেই আয়নার সামনে থেকেও। জীবনানন্দ তবুও সান্ত্বনার স্বরে তাঁর মতো স্বভাবী মানুষকে খোঁজ দিয়ে গেছেন কার্তিকের মাঠের, পৌষের রাত্রির, ফাল্গুনের পঞ্চমী চাঁদের দিকে তাকিয়ে ক্ষণিকের জন্য হলেও মৃত্যুকাঙ্ক্ষাকে ভুলে থাকার উপায়। কিন্তু নাগরিক সভ্যতার বীভৎস একাকীত্বে উন্মাদপ্রায় রবিশংকরের গল্পের নায়ক বা নায়িকারা নিজেদের হারিয়ে ফেলার মতো কোনো প্রকৃতিরও খোঁজ পায় না। পায় না কোনো সোনালি চিলের বিরহকান্নার রোমন্থণ-স্বাদ। একা একা নির্জন ফ্ল্যাটে মরে থেকে যেতে হবে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর দিন। পচা গলা দুর্গন্ধের যন্ত্রণায় হয়তো কোনো পার্শ্ববর্তী ফ্ল্যাট-অধিবাসী অনুসন্ধান করতে আসবে এই ভয়াবহ মৃত্যুর। এরপর শ্রাদ্ধকৃত্যে হাসিমুখে তোলা ছবি পোস্ট হয়ে যাবে কোনো এক সোশ্যাল মিডিয়ায়। অব্যর্থপ্রক্রিয়ায়। রবিশংকরের মেরিলিনরা কোনোদিনও তাই বনলতা সেন হতে পারে না। সান্ত্বনা দানের আভাসে অন্ধকারে মুখোমুখি বসতে পারে না। হতাশ, মতিচ্ছন্ন এক নাগরিক অভিশাপ কামড়ে বেছে নেয় মৃত্যুকে। গল্পের নায়ক কী করে? মেরিলিন আর জীবনানন্দের মধ্যবর্তী বিষণ্ণতায় আক্রান্ত নায়ক জীবনানন্দের আত্মার বেদনাকে লালন করতে করতে মেরিলিনের জন্য অপেক্ষা করে। মেরিলিন আর ফেরে না। নায়ক অন্ধকারের আবরণ খোঁজে। জরায়ুর ন্যায় অন্ধকার। গভীর নিকষ বাইরের আলো ছায়া অসুখ না দেখতে পাওয়া সেই অন্ধকারই পারবে নায়ককে নিবিড় জন্মের স্বাদ দিতে—

"এসব না ভেবে, কারওর জন্য অপেক্ষা না করে, আজ ঘুমিয়ে পড়াই ভালো। একমাত্র তখনই আমার মাতৃজরায়ুতে ঢুকে পড়া যায়। জরায়ুস্মৃতি, জরায়ুগ্রস্থ।"[১০]

জরায়ুর ভিতর প্রবেশের স্বাদ তো রবিশংকর জীবনানন্দ থেকেই গ্রহণ করেছেন। পিতা-পুত্রের যাপন যেন। মাতৃগর্ভে জমে থাকা অন্ধকার আসলে সম্ভাবনাময়। আশাময়। আবার পাশাপাশি উৎসমুখে ডুব দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার উপায় আর নেই। বেঁচে থেকে জীবনের অনেকটা সময় অতিক্রম করে যে মৃত্যু, সে হোক স্বেচ্ছামৃত্যুসম তবু প্রসঙ্গ হয়ে, কৌতূহল হয়ে, ঘৃণা, পরিহাস, তুচ্ছ সহানুভূতির মোড়কে শেষমেশ বেঁচে থেকে যেতেই হয়। কিন্তু

অস্তিত্বকেই যদি বিলীন করে দেওয়া যায় রিভার্স গতিতে। ফিরে যাওয়া যায় শূন্যের ঘরে। তাহলে আর কোনো রেখা বা দাগই থেকে যায় না পৃথিবীর সভ্যতার ত্বকে—

> "হাড়ের ভিতর দিয়ে যারা শীত বোধ করে
> মাঘ রাতে; -তাহারা দুপুরে ব'সে শহরের গ্রিলে
> মৃত্যু অনুভব করে আরও গাঢ়-পীন।"[১১]

আর এই মৃত্যু অনুভূতির তুমুল চেতনা কানের গভীরে ফিসফিস করে বলে যায়—

'life was alone, no name no memory. It had hands, but no one to touch. It had a toungue, but no one to talk to. Life was one, and one was none'. ('Eduardo Galeano, 'Mirrors: Stories of Almost Everyone')

বর্তমান প্রজন্মের দরবারে এযাবৎ 'ইউথেনেশিয়া'র ইচ্ছে প্রবল। বিশ্বের প্রতি দেশ প্রায় বাধ্য হচ্ছে মেনে নিতে নাগরিকদের এই দাবিকে। মেনে নেওয়ার স্তরে এখনও শরীরকেই গুরুত্ব দিচ্ছে আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞান। অথচ আমরা জানি শরীর ঝরে যাওয়ার অনেক আগেই মন ঝরে পড়ে আমাদের। বিজ্ঞান-যুক্তি-মনন সকলেই চেনে এই ছিন্ন পালকের ন্যায় বেঁচে থাকার কান্নাকে। কিন্তু ভয় পায় তার উচ্চারণে। উচ্চারিত হলে ভেঙে পড়তে বাধ্য সভ্যতার অতুল সফলতার ইতিহাস। প্রতিটি নগরপত্তনের নিচে জমে উঠতে পারে প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত আবালবৃদ্ধবনিতার হাহাকার। তাই সমাজ চায় না এই মনের মৃত্যুকাহন গাওয়া হোক আর। তাই রবীন্দ্রনাথের কাছেই ফিরে যেতে হয় আসন্ন ভয়াবহ সত্যি থেকে আড়াল খুঁজে নিতে-

> "আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
> তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।।"[১২]

তথ্যসূত্র :

১. Tolstoy, Leo, Letter on Suicide 1898, Online source- Revoltlib.com; 2021
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৫, 'আমি যদি হতাম' (বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ) পৃ. ১৪৫
৩. বল, রবিশংকর, শ্রেষ্ঠ গল্প, অভিযান পাবলিশার্স, প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, 'মৃত রিপু', পৃ. ৭৩
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৫, ক্যাম্পে (ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যগ্রন্থ) পৃ. ১০৭
৫. বল, রবিশংকর, শ্রেষ্ঠ গল্প, অভিযান পাবলিশার্স, প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, 'অ্যাগনেস, প্রিয় অ্যাগনেস', পৃ. ২০৩
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৫, জীবন (ধূসর পাণ্ডুলিপি কাব্যগ্রন্থ) পৃ. ১১৩
৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৫, আট বছর আগের একদিন (মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থ) পৃ. ১৮৮
৮. বল, রবিশংকর, শ্রেষ্ঠ গল্প, অভিযান পাবলিশার্স, প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, 'ক্যাম্পে', পৃ. ২৬৩
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৫, স্বপ্নের ধ্বনিরা (বনলতা সেন কাব্যগ্রন্থ) পৃ. ১৫৮
১০. বল, রবিশংকর, শ্রেষ্ঠ গল্প, অভিযান পাবলিশার্স, প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৬, 'জরায়ুগ্রস্থ', পৃ. ১০২
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ (সম্পা.), জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, দে'জ পাবলিশিং, প্রকাশ, নভেম্বর ২০১৫, মৃত্যু (মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থ) পৃ. ৪৩১
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, পূর্ণ প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ. ১০৮